ইউনিট ২

# বাংলাদেশের সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

## ভূমিকা

মানুষ সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষা মানুষের সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করে দক্ষ উৎপাদনোক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর করে। তাই শিক্ষা গ্রহণ মানুষের মৌলিক অধিকার। বিভিন্ন কারণে মানুষ শিক্ষার এই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে বাংলাদেশের ৫৪% মানুষ সাক্ষর। এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের ৪৬% মানুষ নিরক্ষর। সকল মানুষকে সাক্ষর এবং ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত করে জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রধান উপায় শিক্ষা। দেশের সকল মানুষকে জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকার সারা দেশে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করেছেন।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট সাতটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:


পাঠ- ২.১: সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

পাঠ- ২.২: সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও সবার জন্য শিক্ষার প্রকৃতি ও পরিসর

পাঠ- ২.৩: বাংলাদেশের পটভূমিতে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

পাঠ- ২.৪: বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পাঠ- ২.৫: বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

পাঠ- ২.৬: সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে নারী ও বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্ব

পাঠ- ২.৭: বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সমাজের ভূমিকা

# পাঠ ২.১ সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সর্বজনীন শিক্ষা বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

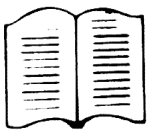

সর্বজনীন শব্দের অর্থ সকলের জন্য। কাজেই সকলের জন্য যে কল্যাণকর শিক্ষা তা-ই সর্বজনীন শিক্ষা। কোন শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা তখনই সর্বজনীন বলব, যখন কোন সমাজ বা দেশের ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে যা সকল নাগরিকের জন্য তা হবে সমভাবে গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণকর। সর্বজনীন শিক্ষার বৈশিষ্ট্য মোটামুটি তিনটি: সমান সুযোগ সুবিধা, বিদ্যালয়ে ভর্তির সমান অধিকার এবং ন্যূনতম স্তর পর্যন্ত অভিন্ন শিক্ষাক্রম।

শিক্ষার সুযোগ সুবিধার মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে বিদ্যালয়, পঠন সামগ্রী, শিক্ষক অন্যতম। দেশের সকল শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষার এই মৌলিক সুযোগ সুবিধাগুলো সহজলভ্য ও অবারিত থাকা সর্বজনীন শিক্ষার উলে-খযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্গম অঞ্চল ও ভৌগোলিক বাধা বিপত্তির কারণে শিক্ষার এই সুযোগ-সুবিধা থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয় না।

বিদ্যালয়ে সুযোগের সমতা সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থায় সকলের জন্য সুনিশ্চিত থাকে। কোন দেশ বা সমাজের ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র ও লিঙ্গ নির্বিশেষে এই অধিকার সকলেরই সমান। এসব কারণে বিদ্যালয়ের দরজা কারো জন্য বন্ধ থাকে না।

একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত থাকে ঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা। শিক্ষার এই স্তরগুলোর সময়কাল আবার সকল দেশে এক রকম নয়। সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের সকল নাগরিকের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ অবারিত থাকে। অর্থাৎ সকলেরই ঐ শিক্ষা গ্রহণ করার কথা।

শিক্ষার্থীর জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের উপযোগী সাক্ষরতা জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের শিক্ষাই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। দেশের সকল স্বাভাবিক শিশুর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার সকল সুযোগসুবিধা সুনিশ্চিত করার জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা তা সর্বজনীন শিক্ষা হিসেবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পাঁচ বছর মেয়াদি। ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে বাংলাদেশের ৬-১০ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য সারা দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৮০ সাল থেকে প্রবর্তিত হয়েছে।

দেশের সকল স্বাভাবিক শিশুকে একটি ন্যূনতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত করে তোলাই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের প্রধান উপায় হচ্ছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করা সত্ত্বেও নির্ধারিত বয়সের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি যারা বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এসেছে তাদের একটি অংশ অকালেই ঝরে পড়ে। ফলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হয় না। এ অবস্থায় আইনের

মাধ্যমে সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়।

১৯৯০ সালে বাংলাদেশ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক আইন সংসদে পাস করে এবং ১৯৯২ সালে প্রতি জেলার একটি করে থানায় পরীক্ষামূলকভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রথমে চালু করা হয়। পরে ১৯৯৩ সালে সারাদেশে তা সম্প্রসারণ করা হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

**অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন**

১. সর্বজনীন শব্দের অর্থ কি?

২. সর্বজনীন শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

৩. বাংলাদেশে কখন সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে?

৪. সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা নির্ণয় করুন।

**আ) রচনামূলক প্রশ্ন**

১. সর্বজনীন শিক্ষা বলতে কি বোঝায়? প্রাথমিক স্তরে সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য কি?

২. সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা অপরিহার্য। আলোচনা করুন।

# পাঠ ২.২ সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও সবার জন্য শিক্ষার প্রকৃতি ও পরিসর

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রকৃতি ও পরিসর বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।

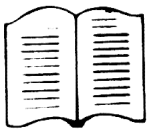

একটি দেশের জনগণের জীবন ও জীবিকার জন্য ন্যূনতম যে মৌলিক শিক্ষা প্রয়োজন তা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অনেক লোক আছে যারা দারিদ্র্যের কারণে শিশুদের পারিবারিক কাজে নিয়োজিত রাখেন। এমন কি অল্প মজুরী এবং খাদ্যের বিনিময়ে অন্যের বাড়িতে গৃহস্থালীর কাজ ও গরু-ছাগল দেখাশুনার কাজে নিয়োগ করেন। আবার খাদ্য এবং জামা কাপড়ের অভাবেও অনেক পিতামাতা শিশু সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় দরিদ্র পিতামাতার সন্তানেরাও যাতে দারিদ্র্যের কারণে ন্যূনতম মৌলিক শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা শুধু সকল শিশুর জন্য বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগই সৃষ্টি করে না বরং তাদের শিক্ষা গ্রহণের সবরকম বাধা দূর করে শিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশও গড়ে তোলে।

প্রাথমিক শিক্ষা ও সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য আপাতত দৃষ্টিতে অভিন্ন হলেও এই দুইয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা কোন বিশেষ সম্প্রদায়, গোষ্ঠী অথবা দেশের সরকার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। যখন কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন শিক্ষাক্রমে তাদের নিজস্ব মতবাদ, ইচ্ছা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। যেমন -মক্তব, টোল, মিশনারি স্কুলের শিক্ষাক্রমে ধর্মীয় প্রভাব বেশি থাকে। অন্যদিকে কোন বিদেশী সরকার কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শাসকের স্বার্থের প্রভাব থাকে। স্বাধীন সার্বভৌম দেশের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার পরিচালিত শিক্ষা জনকল্যাণে নিবেদিত। এতে সকল সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর শিশুরা তাদের আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান নির্বিশেষে সকলের চাহিদা অনুসারে একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করতে পারে। এটিই সর্বজনীন শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

আগেই বলা হয়েছে যে, সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা অন্যতম হাতিয়ার। সকল দেশে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পরিসর সমান নয়। দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষার চাহিদার ওপর এই শিক্ষার পরিসর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পরিসর পাঁচ বছর মেয়াদি। ড. কুদরাত-এ-খুদা এবং ড. মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাকে দেশের মানুষের মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরণে অপর্যাপ্ত বিবেচনা করে একে আট বছর মেয়াদি করার জোর সুপারিশ করেছেন। বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালের পর প্রাথমিক শিক্ষাকে আট বছর মেয়াদি করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন। মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডের সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ছয় বছর মেয়াদি। আবার কোন কোন দেশে এই শিক্ষা ৮ বছর মেয়াদি।

**সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা: পারস্পরিক সম্পর্ক**

আর্থ সামাজিক পার্থক্য, লিঙ্গ ভেদে, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমান সুযোগ সৃষ্টি করে সবার জন্য যে শিক্ষা তা সর্বজনীন শিক্ষা। শুধু সমান সুযোগ সৃষ্টি করলেই সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত হয় না। এখানে দেশের সকল মানুষের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তাই সর্বজনীন শিক্ষাকে নিশ্চিত করার একটি কৌশল হিসেবে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করা হয়।

বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় সকল অভিভাবক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে প্রেরণ এবং একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করাতে আইনগতভাবে বাধ্য। আইনের মাধ্যমে অভিভাবকের ওপর ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে প্রেরণের চাপ সৃষ্টি করা হয়। অনিবার্য কারণ ছাড়া বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের প্রেরণ না করা দন্ডনীয় অপরাধ। এজন্য দন্ড প্রাপ্তির ব্যবস্থাও রয়েছে।তাহলে সর্বজনীন শিক্ষা দাঁড়াচ্ছে একটি লক্ষ্য হিসেবে। আর বাধ্যতামূলক শিক্ষা ঐ লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায় মাত্র।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা একটি আইনানুগ ব্যবস্থা, কেউ তা অমান্য করলে বিধি মোতাবেক অভিভাবককে জেল জরিমানা উভয়ই দেওয়া যেতে পারে। এমনকি অভিভাবক ছাত্র কোন তৃতীয় পক্ষ শিশুদের বিদ্যালয় গমনে বাধা সৃষ্টি করলে তারাও দন্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত করে শাস্তি দেওয়া যায়। তবে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন এবং আইনের কড়াকড়ি আরোপের পূর্বে শিক্ষার সকল সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

সর্বজনীনতা হচ্ছে সবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার পূর্ণ ব্যবস্থা করা। আর বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হচ্ছে ব্যতিক্রম ছাড়া শিক্ষার জন্য দেওয়া সব সুযোগ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা যাতে অপচয় না ঘটে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন; ২.২

**অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন**

১. উন্নয়নশীল দেশে বহু অভিভাবক কেন তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারে না?

২. প্রাথমিক শিক্ষা ও সর্বজনীন শিক্ষার মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করুন।

৩. সকল দেশের সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার পরিসর সমান নয় কেন?

৪. সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পার্থক্য কি?

# পাঠ ২.৩ বাংলাদেশের পটভূমিতে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

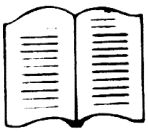

ইংরেজদের এদেশে আগমনের পূর্বে বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রতি ৪০০ জন মানুষের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল - একথা আমরা উইলিয়াম এডামের রিপোর্ট থেকে জানতে পারি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন গৌরবময় ইতিহাসের অধিকারী হয়েও সুদীর্ঘকাল পরাধীনতার কারণে আজও আমরা ২০০০ জন মানুষের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করতে পারিনি। বিদেশী শাসকগণ বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু রেখে নির্বিঘ্নে শোষণ ও শাসন স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে এখানে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ও কার্যকর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে স্বাধীনতা কালে বাংলাদেশে মাত্র ১৫% মানুষ সাক্ষর ছিল। এর অর্থ ৮৫% বাংলাদেশের মানুষ ছিল তখন নিরক্ষর। এই বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষের বোঝা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের যে কোন কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির আধিক্য সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার পথে বড় অন্তরায় ছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই শিক্ষার সংস্কারের মাধ্যমে দেশের সকল মানুষকে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ সৃষ্টি হয়। যতটা সম্ভব কম সময়ের মধ্যে দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী ও শক্তিশালী করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশে গঠিত সকল শিক্ষা কমিশনই দেশে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে জোর সুপারিশ করে। দেশের প্রচলিত চিরাচরিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল মানুষকে জীবন ও জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৮০ সালে দেশে প্রথম সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। লক্ষ্য ছিল, ২০০০ সালের মধ্যে দেশের ৬-১০ বছর বয়সী সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা। সে উদ্দেশ্যে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, পুরাতন বিদ্যালয় সংস্কার, বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ, নতুন শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য পিটিআইগুলো আধুনিকীকরণ, বিনামূল্যে শিশুদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গৃহীত হয়। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি পেলেও এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৯০% এর পরিবর্তে মাত্র ৬০% অর্জিত হয়। অবশ্য লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জিত না হলেও উলি- খিত কর্মসূচির আওতায় সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

সর্বজনীন ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও নান কারণে বহু শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। আবার যারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তাঁদের একটি বিরাট অংশ পাঁচ

বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করার পূর্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে ফলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বাধার সৃষ্টি হয়।

শিশু অধিকার বিষয়ে জাতিসংঘ সনদ বাস্তবায়ন, ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলন, ১৯৯৩ সালের দিল-ী ঘোষণার প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন ও অঙ্গীকার ইত্যাদি আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০০ সালের মধ্যে ৯৫% শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি, ৬০% শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন এবং ঝরে পড়ার হার ন্যূনতম পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই সরকার ১৯৯০ সালে দেশে পাঁচ বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস এবং ১৯৯২ সীমিতভাবে ও ১৯৯৩ সাল থেকে সারা দেশে এই আইন বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

**অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন**

১. প্রাক ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশ অঞ্চলে কত জনের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল?

২. 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলন কোথায় ও কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?

**আ) শূন্যস্থান পূরণ কর**

১. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ..... মানুষ নিরক্ষর ছিল।

২. বাংলাদেশে .....সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়।

৩. ১৯৯৩ সাল থেকে সারা দেশে এই .....বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়।

# পাঠ ২.৪ বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৯০) এর বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- উল্লিখিত আইনে গঠিত বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন ।

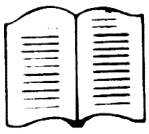

বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সরকার দেশের ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুর জন্য পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেন। ১৯৯০ সালে সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস করা হয়। ১৯৯২ সালে সীমিতভাবে এবং ১৯৯৩ সাল থেকে সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। বর্তমান পাঠে বাংলাদেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০ এর বিশেষ দিকগুলো এবং তা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হল।

**বাধ্যতামূলক প্রাথমিকশিক্ষা আইন, ১৯৯০**

**১. আইনে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের অর্থ:**

(ক) অভিভাবক: এর অর্থ শিশুর পিতা বা পিতার অবর্তমানে মাতা বা উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন এমন ব্যক্তি।
(খ) কমিটি: এর অর্থ দ্বারা ৪ এর অধীন গঠিত বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি।
(গ) প্রাথমিক শিক্ষা: এর অর্থ শিশুদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা অনুমোদিত শিক্ষা।
(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: এর অর্থ যে কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
(ঙ) শিশু: এর অর্থ ছয় বছরের কম নয় ও দশ বছরের অধিক নয় এরূপ বয়সের বালক বা বালিকা।

**২. কি কারণে শিশু এ আইনের আওতাভুক্ত হবে না:**

(ক) অসুস্থতা বা অন্য কোন অনিবার্য কারণ।
(খ) আবাসস্থল থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকা।
(গ) শিশু বর্তমানে যে শিক্ষা গ্রহণ করেছে তা প্রাথমিক শিক্ষার সমমানের হওয়া।
(ঙ) মানসিক অক্ষমতা কারণে।

**৩. আইন বাস্তবায়নে গঠিত বিভিন্ন কমিটি:**

**(ক) পল্লী এলাকার ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটি গঠন-**

- থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন ওয়ার্ড মেম্বার- চেয়ারম্যান
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনাক্রমে থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ও দুইজন বিদ্যোৎসাহী মহিলা সদস্য
- ওয়ার্ডের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা- সদস্য
- থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা- সদস্য সচিব

**(খ) পৌর এলাকার ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটি গঠন-**

- পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন ওয়ার্ড কমিশনার- চেয়ারম্যান
- ওয়ার্ড কমিশনারের সাথে আলোচনাক্রমে পৌরসভা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ও দুইজন বিদ্যোৎসাহী মহিলা- সদস্য
- ওয়ার্ডের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক- সদস্য
- পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা- সদস্য সচিব

**দ্রষ্টব্যঃ** থানা শিক্ষা অফিসার, থানা নির্বাহী অফিসার, পৌরসভার চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে ওয়ার্ডকমিটি গঠন ও প্রয়োজনে পুনর্গঠনের ব্যবস্থা নেবেন। তিনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কোষকে অবহিত করবেন।

**ওয়ার্ড কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ**

১. কমিটি ওয়ার্ডে বসবাসরত ৬-১০ বছর বয়সের সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করবে।
২. কমিটি শিশু জরিপ করে তাতে বিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হতে বাধ্য এবং যারা ভর্তি হওয়া থেকে অব্যাহতি পাবে তাদের নাম লেখবে।
৩. প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে শিশু জরিপ তালিকা সংশোধন করতে হবে। এ তালিকায় যে শিশুর বয়স ১০ বছর অতিক্রম করবে তার নাম বাদ পড়বে। যার বয়স ৬ বছর হবে তার নাম অন্তর্ভুক্ত হবে।
৪. তালিকা ও সংশোধিত তালিকার কপি থানা শিক্ষা অফিসারও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে।
৫. যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোন শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি না হলে বা প্রধান শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া কোন শিশু বিদ্যালয়ে সাতদিন অনুপস্থিত থাকলে কমিটি শিশুর অভিভাবককে লিখিত নোটিশ প্রদান করে শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারে।

**ইউনিয়ন কমিটিঃ**

- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান- চেয়ারম্যান
- ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড মেম্বার- সদস্য
- ইউনিয়নে কর্মরত সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার- সদস্য
- ওয়ার্ড কমিটির সকল সদস্য সচিব- সদস্য

- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষানুরাগী পুরুষ ও একজন মহিলা- সদস্য
- কমিটির সদস্যগণের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য- সদস্য সচিব

**দায়িত্ব ও কর্তব্য:**

- ইউনিয়ন কমিটি, ওয়ার্ড কমিটিগুলোর কার্যাবলি তদারকী ও সমন্বয় সাধন করে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নির্দেশ প্রদান করবে।
- কমিটি প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে তা থানা কমিটিকে অবহিত করবে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে ও পরিবীক্ষণ কোষে প্রেরণ করবে।

**থানা কমিটি:**

- থানা নির্বাহী অফিসার- চেয়ারম্যান
- থানা মেডিকেল অফিসার- সদস্য
- থানা কৃষি অফিসার- সদস্য
- থানা পশুপালন অফিসার- সদস্য
- থানার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান- সদস্য
- থানার কর্মরত সকল সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার- সদস্য
- থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত ৩ জন বিদ্যোৎসাহী মহিলা এবং ২ জন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ- সদস্য
- থানা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির ৫জন চেয়ারম্যান- সদস্য
- থানা শিক্ষা অফিসার- সদস্য সচিব।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** স্থানীয় মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কমিটিকে পরামর্শ প্রদান করবেন।

**দায়িত্ব ও কর্তব্য:**

১. কমিটি থানার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটিগুলোর কার্যাবলি পর্যালোচনা করে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবে।
২. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আইনে উল্লেখ নেই অথচ প্রয়োজন এমন কার্যক্রম কমিটি গ্রহণ করতে পারবে।
৩. প্রতি মাসে কমিটি কমপক্ষে একটি সভায় মিলিত হবে এবং সভার কার্যবিবরণী জেলা কমিটি ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কোষে প্রেরণ করবে।

**জেলা কমিটি:**

- জেলা প্রশাসক- চেয়ারম্যান

- পৌরসভার চেয়ারম্যান- সদস্য
- জেলা গণসংযোগ কর্মকর্তা- সদস্য
- থানা নির্বাহী অফিসার- সদস্য
- থানা শিক্ষা অফিসার- সদস্য
- জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত দুইজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তিনজন বিদ্যোৎসাহী মহিলা ও দুইজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ- সদস্য
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার- সদস্য
- থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত দুইজন ওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য সচিব (উভয়ক্ষেত্রে একজন পল্লী এলাকা ও একজন পৌর এলাকা থেকে)- সদস্য
- থানা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত দুইজন প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান (পল্লী এলাকার একজন ও পৌর এলাকার একজন)- সদস্য
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার- সদস্য সচিব

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও অনুরূপ পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন প্রতিনিধি কমিটির উপদেষ্টা হবেন।

**দায়িত্ব ও কর্তব্য:**

১. কমিটি বছরে কমপক্ষে তিনটি সভায় মিলিত হবে। যার একটি শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিকে ও একটি শিক্ষাবর্ষের শেষ দিকে হওয়া বাঞ্চনীয়।
২. কমিটি থানা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটির কার্যাবলি তদারক করে প্রয়োজনে তাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবে।
৩. কমিটি জেলার প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কোষকে অবহিত করবে।

**জাতীয় পর্যায়ের কমিটি:**

- শিক্ষা সচিব- সভাপতি
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব- সদস্য
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক- সদস্য
- তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব- সদস্য
- বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক- সদস্য
- বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি- সদস্য
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কোষের মহাপরিচালক- সদস্য সচিব

**দায়িত্ব ও কর্তব্য**

এ কমিটি বেতার ও টেলিভিশনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রেষণামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করবে।এছাড়া বিভিন্ন কমিটির কার্যাবলি পর্যালোচনা করে তাদেরকে উপযুক্ত উপদেশ ও সহযোগিতা দিয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

**দন্ড**

১. যদি কোন কমিটি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তবে এর প্রত্যেক সদস্য অনধিক দুইশত টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত হবেন।
২. যদি কোন অভিভাবক এ আইনে প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন তবে তিনি অনধিক দুইশত টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত হবেন।

**অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণঃ**

১. কমিটি চেয়ারম্যানের লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এ আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করতে পারবে না।
২. বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাঃ
৩. আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দিয়ে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

**অ) শুদ্ধ এবং ভুল নির্ণয় করুন**

১. ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করা হয়।
২. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনে ‘শিশু’ বলতে ছয় বছরের কম নয় এবং দশ বছরের অধিক নয় এরূপ বালক বালিকাকে বোঝায়।
৩. ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির জনসংখ্যা হবে ৬ জন।
৪. ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সচিব হবেন চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রধান শিক্ষক।
৫. কোন অভিভাবক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনে প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে ২০০ টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত হবেন।

# পাঠ ২.৫ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি–

- একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয়ের কার্যাবলি উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।

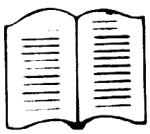

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের প্রয়োজনে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। শিশু সমাজের আগামী দিনের বয়স্ক সদস্য। বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত করে তাকে আগামী দিনের পূর্ণবয়স্ক মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপযোগী করে গড়ে তোলে। এভাবে শিশু পরবর্তী জীবনে পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

সাধারণ দৃষ্টিতে বিদ্যালয় বলতে মানুষ বিদ্যালয় গৃহ ও তার আনুষঙ্গিক আসবাবপত্রকেই বুঝে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। গৃহ ও আসবাবপত্র বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য অর্জনের একটি উপায় মাত্র। বিদ্যালয়ের প্রাণশক্তি ধারণ করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ। গৃহ ও আসবাবপত্র, পরিবেশ এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এই সব সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় যে কাজগুলো রয়েছে তা হচ্ছে (১) বিদ্যালয় এলাকায় ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের সংখ্যা নিরূপণ এবং কতজন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এবং কতজন হয়নি তার তালিকা তৈরি করা এবং পিতামাতার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা (২) ভর্তি হওয়া শিশুদের নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে গমনাগমনসহ পাঁচ বছরের শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ আকর্ষণীয় করা (৩) শিক্ষকদের নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠন কাজকে শিশুদের নিকট আনন্দদায়ক করা। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা বলতে বিদ্যালয় সংগঠনের মানব উপাদান অর্থাৎ প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজ ও উদ্যোগকেই নির্দেশ করে থাকে। কাজেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াভুক্ত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করার মধ্য দিয়েই তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য। একটি বিদ্যালয় এলাকায় এই বয়সের কত শিশু রয়েছে তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা বিদ্যালয়ের কাজ। প্রতি বছর শিশু জরিপের মধ্য দিয়ে এই কাজটি সম্পন্ন হয়। শিশু জরিপ কাজে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণও এখানে সহযোগিতাদান করতে পারেন। কিন্তু জরিপের ফলাফল থেকে সহজেই জানা যায় কতজন শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এবং হয়নি। প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া শিশুদের পিতামাতা বা অভিভাবকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে ভর্তি না হওয়ার কারণগুলো জেনে তাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে পারেন। এখানে পিতামাতা ও অভিভাবকদের নিকট বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন সম্পর্কে অবহিত করবেন। তবে এই

আইন বরখেলাপকারীদের শাস্তি ও দন্ড সম্পর্কে গুরুত্ব দেয়ার পরিবর্তে শিশুর জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা পিতামাতার নিকট ব্যাখ্যা করে তাদের অনুপ্রাণীত করার কৌশল গ্রহণই উত্তম হবে।

বিদ্যালয় এলকায় ৬-১০ বছর বয়সী ১০০% শিশুকে ভর্তি করাই যথেষ্ট নয়। এই শিশুদের পাঁচ বছর বিদ্যালয়ে ধরে রেখে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির মধ্যেই বাধ্যতামূলক শিক্ষার সাফল্য নির্ভরশীল। কাজটি খুব কঠিন। এজন্য শিক্ষকগণ বিদ্যালয় এবং শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র সুন্দর করে সাজিয়ে ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রেখে শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় করতে পারেন। শিশুদের সহায়তায় বিদ্যালয়ের সামনে ফুলের বাগান ও সীমানা বরাবর শোভাবর্ধনকারী ফুল ও ফলের গাছ লাগিয়ে বিদ্যালয়কে সুন্দর করা যায়। শ্রেণীকক্ষের দেয়ালে শিক্ষামূলক বাণী ও নীতিকথা লেখাসহ সুদৃশ্য ছবি ও পোস্টার দিয়ে সাজিয়ে বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষ শিশুদের নিকট যেমন আকর্ষণীয় করা যায় তেমনি শিশুরা বিদ্যালয়ে অধিক সময়ে অবস্থান করতে ও স্বচ্ছন্দবোধ করে।

ছোট ছোট শিশু মা বাবার আদর, যত্ন ও স্নেহ ভালবাসা বাড়িতে রেখে বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশে আসে। শিক্ষক শিক্ষিকাগণের নিকট থেকে শিশুরা মাতৃ ও পিতৃসুলভ আদর, যত্ন ও স্নেহ ভালবাসা পেলে বাড়ির চেয়ে বিদ্যালয়ের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে। শ্রেণীকক্ষের পঠন পাঠন প্রক্রিয়াকে খেলা, কাজ, গান ও নাচের মাধ্যমে শিক্ষক শিশুর নিকট আনন্দময় করে তুলতে পারেন। এতে বিদ্যালয় ও পাঠের প্রতি শিশুর আগ্রহও অনুরাগ বেড়ে পায়।

আবার শিশু নানান কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে শিশুর বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিলে শিক্ষকের প্রতি পিতামাতার যেমন আস্থা বাড়ে তেমনি শিশুর মধ্যেও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণও এ কাজে শিক্ষকদের সহায়তা করতে পারেন।

শিক্ষকগণ সময়মত এবং নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রেণীতে পাঠ দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা এবং পর্যাপ্ত সহপাঠক্রমিক ব্যবস্থা করে শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন। এভাবে বিদ্যালয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫

**অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ**

১. বিদ্যালয়ের কাজ কি?
২. শিশু জরিপ কি?
৩. বিদ্যালয়কে কিভাবে শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় করা যায়?
৪. কিভাবে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের কাজ শিশুদের নিকট আনন্দময় করা যায়?
৫. বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসা-যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকগণের দায়িত্ব বর্ণনা করুন।

**আ) শুন্যস্থান পূরণ করুনঃ**

১. ..... একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।
২. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ..... বছর বয়সী শিশুদের জন্য।
৩. শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের নিকট শিশু আদর স্নেহ পেলে ..... প্রতি ঝুঁকে পড়ে।
৪. খেলা, কাজ, নাচ, গানের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠনকে শিশুদের নিকট ..... করা যায়।
৫. মানসম্মত শিক্ষা এবং ..... কার্যাবলির ব্যবস্থা করে শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সাধন করা যায়।

পাঠ ২.৬

# সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে নারী ও বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্ব

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি–

- 'নিরক্ষর মানুষ জনশিক্ষার প্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়' - এ উক্তিটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বয়স্ক শিক্ষা বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

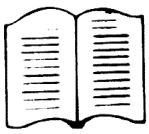

বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু রয়েছে। এজন্য ১৯৯০ সালে প্রয়োজনীয় আইনও জারি করা হয়েছে। পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে পিতামাতা এখন আইনত বাধ্য। এই আইন ভঙ্গ করা দন্ডনীয় অপরাধ।

সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন জারি এবং তা বাস্তবায়নের শুরুতে বাংলাদেশে ৬৮% মানুষই নিরক্ষর ছিল। এই নিরক্ষর মানুষের বেশির ভাগই নারী। সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার পর বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি হলেও নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার খুব বাড়েনি। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়ার হার এখনও অনেক বেশি। শহর অপেক্ষা গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে শিশু উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং ঝরে পড়ার হারও বেশি। শহর ও গ্রাম এলাকার এই পার্থক্যের একটি অন্যতম কারণ, গ্রামের মানুষের মধ্যে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেশি। নিরক্ষর মানুষ তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া সম্পর্কে বিভিন্ন কারণে সজাগ নন।

নিরক্ষর মানুষ জনশিক্ষার প্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়ান; কারণ শিক্ষার গুরুত্ব যথাযথভাবে বুঝতে পারেন না। চাকুরী লাভের একটি উপায় ছাড়া শিক্ষাকে তাঁরা আর কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে উৎসাহী নন। অথচ মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষার প্রভাব রয়েছে। শিক্ষার এই শক্তি নিরক্ষর মানুষকে যত দ্রুত উপলব্ধি করানো যায় ততই মঙ্গল। সাক্ষরতা মানুষের মধ্যে যে সব গুণাবলি ও ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটায় তা এভাবে বলা যায়, শিক্ষা মানুষকে যে গুণাবলি অর্জনে সাহায্য করে তা হচ্ছে-

- আত্মমর্যাদাবোধ
- আত্মবিশ্বাস
- মননশীলতা
- জীবন গঠনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি
- ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের গুণাবলি
- স্বনির্ভরতা।

বাংলাদেশের নিরক্ষরদের একটি বড় অংশ বয়স্ক মানুষ। আবার বয়স্ক নিরক্ষরদের অধিকাংশই নারী। নারী শিক্ষার অর্থই হচ্ছে শিক্ষিত মা তৈরি করা। একজন শিক্ষিত মা শিশু প্রতিপালন এবং পারিবারিক উন্নতি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে

সক্ষম। তাই মায়ের শিক্ষা মানে একটি জাতির শিক্ষা। তাই সম্রাট নেপোলিয়ন একদা বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও। আমি তোমাদের একটি উন্নত জাতি উপহার দিব।" সম্রাট নেপোলিয়নের এই বাণী সর্বযুগে সকল দেশের মানুষের জন্য সত্য। অভিজ্ঞতার আলোকেও আমারা দেখি শিক্ষিত বাবার সন্তান অনেক সময় নিরক্ষর হয়। কিন্তু শিক্ষিত মায়ের সন্তানকে কখনই নিরক্ষর হতে দেখা যায়নি। শিশু পরিবারে মায়ের কাছেই প্রথম সামাজিক ও নৈতিক আচার আচরণ, স্বাস্থ্য বিধি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা পায়। বাংলাদেশে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে পিতামাতা, বিশেষ করে মাদের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিশুর পিতামাতাসহ সমাজের বয়স্ক সকল নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষর করতে তুলতে পারলে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সহজ হবে কারণ তাঁরা জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন। আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের প্রয়োজনই হবে না। নিজেদের প্রয়োজন ও সহজে শিশু সন্তানদের শিক্ষার জন্য সহযোগিতাদানে এগিয়ে আসবে।

বয়স্ক মানুষের শিক্ষা আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় আয়োজন সম্ভব নয়। বয়স্ক মানুষের প্রয়োজন ও সময় অনুযায়ী এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর সহ ব্রাক, প্রশিকা এবং অন্যান্য বহু এন জি ও বাংলাদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬

**সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ**

১. শহর অপেক্ষা গ্রামে শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কম কেন?
২. একটি জাতির জন্য মায়ের শিক্ষার প্রয়োজন কি?
৩. সাক্ষরতা মানুষের মধ্যে কি ঘটায়?
৪. শিশু মায়ের কাছে কি কি বিষয়ে শিক্ষা পায়?
৫. পিতামাতা শিক্ষিত হলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন হবে না কেন?

পাঠ ২.৭

# বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সমাজের ভূমিকা

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বাস্তবায়নের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

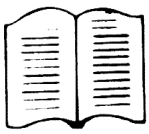

আজকের বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার এক গৌরবময় ইতিহাসের উত্তরাধিকার। বাংলাদেশে বর্তমানে ৮০ হাজারের বেশি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই সামাজিক উদ্যোগেই অতীতে স্থাপন করা হয়। সমাজের মানুষই আপন প্রয়োজনে বিদ্যালয়গুলোর নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করতেন। ১৯৭৩ সালে একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তৎকালীন প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ ও শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা দেয়া হয়। প্রত্যাশা ছিল, শিক্ষকগণ সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা পেলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করাসহ বিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষা বিস্তার তথা শিশু ভর্তি ও তাদের শিক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কিন্তু আসলে তা হয়নি। বিদ্যালয় ও সমাজের মানুষের মধ্যে বহুকাল ধরে যে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল তা ঐ সরকারীকরণের সময় থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। বিদ্যালয় মেরামত, আসবাবপত্র ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিক্ষকগণ আর সমাজের মুখাপেক্ষি নন। এসবের দায়িত্ব এখন সরকারের। ফলে বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় সমাজের ভূমিকা না থাকায় শিক্ষকগণের নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, শ্রেণী পাঠদান ও অন্যান্য কাজে শৈথিল্য দেখা দেয়। তবে দেশের সকল বিদ্যালয়ের বেলায় এরূপ ঢালাও অভিযোগ সত্য নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা জোরদার এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে সামাজিক সংশি- ষ্টতা অপরিহার্য। এই উপলব্ধি থেকে ১৯৮০ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সময় এস এম সি এবং পি টি এ গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এমন কি এম এম সি ও পি টি এ গঠনের নীতিমালা এবং বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যাবলিতে তাঁদের ভূমিকা স্থির করে ব্যাপক প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় দেশের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এস এম সি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে, তবে পি টি এ'র অস্তিত্ব বিরল এবং যেখানে আছে তা প্রায় কাগজে মাত্র।

বিদ্যালয়ের সুফল সমাজই ভোগ করে থাকে। কাজেই বিদ্যালয়ের কার্যাবলিতে সমাজের সম্পৃক্ততা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ব্যবস্থাপনা ও মানসম্মত শিক্ষা সম্ভব নয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সমাজ তথা স্থানীয় মানুষের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন আরো বেশি। এস এম সি এবং পি টি এ সমাজের প্রতিনিধি হিসেবেই বিদ্যালয়ের কাজে যুক্ত হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কাজগুলোর কথা আগেই উলে- খ করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে এই কাজগুলো হচ্ছে: (১) বিদ্যালয় শিক্ষার ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের চিহ্নিত করা, (২) এই শিশুদের কতজন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এবং হয়নি তা জানা, (৩) ভর্তিকৃত শিশুদের পাঁচ বছরের শিক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন করতে সাহায্য করা, (৪) বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

বলাই বাহুল্য, এই কাজগুলোতে এস এম সি ও পি টি এ এবং স্থানীয় জনগণ ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে আইন এবং শাস্তির বিধান করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন। সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে সুজিয়ে তাদের ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করাই উত্তম। পি টি এ এবং এস এম সি ও সমাজের ব্যক্তিরা এখানে উলে- খযোগ্য অবদান রাখতে পারেন।

বিদ্যালয়, শিক্ষক ও সমাজ একে অপরের শিক্ষামূলক কাজের পারস্পরিক অংশীদার। বিদ্যালয় সমাজের শিশুদের শিক্ষার কাজে নিয়োজিত একটি সংগঠন। শিক্ষক সমাজের একজন সদস্য এবং বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একনিষ্ঠ কর্মী। এস এম সি এবং পি টি এ সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে বিদ্যালয়ের কার্যাবলি পরিচালনায় সহযোগী সংগঠন। সকলের উদ্দেশ্য অভিন্ন, আর তা হচ্ছে সমাজের ভাবী সদস্যদের শিক্ষিত করে তোলা। এই বোধটি সৃষ্টির জন্য নানাবিধ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যাবলি গ্রহণ করা আবশ্যক। শিক্ষকদেরই একাজে অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের খেলাধুলা, জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় দিবস পালন, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ, বিচিত্রানুষ্ঠান, শিশু নাট্যানুষ্ঠান, শিশু মেলা, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদির আয়োজন করে পি টি এ এবং এস এম সি স্থানীয় লোকজনকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। এতে শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে নৈপুণ্য দেখে একদিকে যেমন তাঁরা আনন্দবোধ করবেন তেমনি বিদ্যালয়ের প্রতিও তাঁদের অনুরাগ সৃষ্টি হবে। যে সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করে তাদের পিতামাতাকে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আনুষঙ্গিকভাবে পুরস্কার প্রদানেরও ব্যবস্থা রাখতে পারে।

পি টি এ এবং এস এম সি কাগজে সংগঠন হিসেবে রাখা উচিত নয়। প্রধান শিক্ষক সদস্যদের বিভিন্ন সভায় লিখিতভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করবেন। এছাড়া এ টি ই ও, টি ই ও, ডি পি ই ও সহ বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ বিদ্যালয় পরিদর্শনে আগমনের সময় পি টি এ এবং এস এম সি সদস্য এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানাতে পারেন। কর্মকর্তারা সমাজের মানুষের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ আলোচনা করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং গণজীবনে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন। তাতে বিদ্যালয়ের কাজে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হবেন।

এস এম সি কে শুধু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে বললেই চলবে না। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান বিষয়ে কিছু আইনগত ক্ষমতাও এস এম সি কে দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে সময়মত এবং নিয়মিতভাবে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য আইনগত খবরদারির ব্যবস্থা রাখা দরকার। এতে এস এম সি বিদ্যালয়ের কার্যাবলিতে অংশগ্রহণে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ ও তৎপর হয়ে উঠবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭

**অ) ঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিনঃ**

১. বিদ্যালয় মেরামত এবং বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ইত্যাদি সরবরাহের দায়িত্ব সরকারের।
২. দেশে বহু বিদ্যালয় আছে যেখানে এস এম সি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে থাকে।
৩. বাংলাদেশের সব বিদ্যালয়ে পি টি এ'র অস্তিত্ব সক্রিয়।
৪. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাধানে এস এম সি কে কোন আইনগত ক্ষমতা দেয়া উচিত নয়।
৫. বিদ্যালয়, সমাজ ও এস এম সি একে অপরের শিক্ষামূলক অংশীদার।

**চূড়ান্ত মূল্যায়ন**

**অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন:**

১. সর্বজনীন শিক্ষার অর্থ কি?
২. কি কারণে উন্নয়নশীল দেশের বহু পিতামাতা তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে পারেন না।
৩. প্রাক-ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশ এলাকায় কতজন মানুষের জন্য একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল?
৪. কোন অভিভাবক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ভঙ্গ করলে তাঁকে কত টাকা দন্ড প্রদানের বিধান রয়েছে?
৫. একটি জাতির জন্য মায়ের শিক্ষার প্রয়োজন কি?
৬. বিদ্যালয়ের সুফল কে ভোগ করে?

**আ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন:**

১. বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ৮ বছর মেয়াদি।
২. ''সবার জন্য শিক্ষা'' শীর্ষক বিশ্বসম্মেলন ১৯৯৫ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়।
৩. একটি জাতির জন্য মায়ের শিক্ষার তেমন প্রয়োজন নেই।
৪. প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের ফলে সমাজ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্ক লুপ্ত হয়।
৫. বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী অর্থেই অতীতে স্থাপিত হয়।